পায়রা

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

বিষয় কোড : ০০৭

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা, পূর্ণমান : ১০০

BCS CONFIDENCE বেলাল আহমেদ রাজু কনফিডেন্স

৪৭তম লিখিত মডেল টেস্ট-৫

[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১. **নিম্নলিখিত যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন :** ৪ × ১০ = ৪০

** **নির্দেশনা :** সর্বোচ্চ নম্বর ৩.৫, এভারেজ নম্বর ২.৫-৩। কনসেপ্ট সঠিক না হলে শূন্য পেতে পারে। প্রতি ৩টি ভুল বানানের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

(ক) **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে বহুত্ববাদ (Pluralism) কী ভূমিকা রাখে?**

নমুনা উত্তর : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে বহুত্ববাদ (Pluralism) এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা বলে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি শুধু রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়; বরং রাষ্ট্রের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা, বহুজাতিক কোম্পানি, এনজিও, সামাজিক আন্দোলন এবং আঞ্চলিক জোট—এ ধরনের বহু-অভিনেতা বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে যে আধুনিক বিশ্বে অর্থনীতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, মানবাধিকারসহ বহু ইস্যুতে রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরতা তৈরি হয়েছে, যা সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় UNFCCC, IPCC, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং প্রযুক্তি কোম্পানির সম্মিলিত প্রচেষ্টা বহুত্ববাদের বাস্তব প্রতিফলন।

এ ছাড়া বহুত্ববাদ সামরিক শক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষমতা, কূটনীতি ও নরম শক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে এবং বৈশ্বিক বিষয়গুলো সমাধানে বহুমাত্রিক শক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করে। COVID-19 মহামারিতে WHO, বিভিন্ন রাষ্ট্র, বৈজ্ঞানিক নেটওয়ার্ক ও ভ্যাকসিন কোম্পানির সমন্বিত উদ্যোগ দেখায় যে রাষ্ট্র একা আন্তর্জাতিক সংকট মোকাবিলা করতে পারে না। ফলে বহুত্ববাদ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আরও বিস্তৃত ও বাস্তবানুগভাবে ব্যাখ্যা করে এবং বৈশ্বিক সহযোগিতার কাঠামো বোঝায়।

(খ) ডিপফেক (Deepfake) কীভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে?

নমুনা উত্তর : ডিপফেক (Deepfake) হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি করা ভুয়া কিন্তু অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ছবি, অডিও বা ভিডিও, যা মানুষের আসল চেহারা ও কণ্ঠস্বরকে নকল করতে পারে। এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গুরুতর প্রভাব ফেলে, কারণ ডিপফেক সহজেই রাজনৈতিক নেতাদের নামে মিথ্যা বক্তব্য ছড়াতে, ভুয়া বিতর্ক তৈরি করতে এবং নির্বাচনের সময় বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাতে ব্যবহার করা যায়। এর ফলে জনগণ সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করতে অসুবিধায় পড়ে, রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ে এবং গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যায়। নির্বাচনের আগে বা ভোট গ্রহণের সময় ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল হলে ভোটারদের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

এ ছাড়া ডিপফেক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আঘাত হানতে পারে, কারণ ভুয়া ভিডিও ব্যবহার করে হিংসা উস্কে দেওয়া, সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সুনাম নষ্ট করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নেতার নামে ভুয়া স্বীকারোক্তি বা কেলেঙ্কারির ভিডিও প্রকাশ পেলে তা জনমতকে দ্রুত বদলে দিতে পারে, যদিও তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন, মিডিয়া এবং নিরাপত্তা সংস্থার কাজ কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে ডিপফেক প্রযুক্তি গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের আস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে।

(গ) জলবায়ু কূটনীতিতে 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' (Loss and Damage) তহবিলের গুরুত্ব কী?

নমুনা উত্তর : জলবায়ু কূটনীতিতে 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' (Loss and Damage) তহবিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অপরিবর্তনীয় ক্ষতির মুখে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেয়। UNFCCC-এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে এই তহবিলে ২৭টি দেশ মোট ৭৬৮.৪ মিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি হলেও এখনও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু ক্ষতি মোকাবিলায় প্রতি বছর প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমান প্রতিশ্রুতি মোট চাহিদার মাত্র ০.২%-এর সমান। উদাহরণস্বরূপ, COP28-এ প্রথম ঘোষণার সময় বড় দাতারা—জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও UAE—প্রতিটি দেশ প্রায় ১০০ মিলিয়নের কাছাকাছি প্রতিশ্রুতি দিলেও তা ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় খুব সীমিত।

এ তহবিল জলবায়ু ন্যায়বিচার, আন্তর্জাতিক আস্থা এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশসহ জলবায়ু–ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, উপকূল ভাঙন, জীবিকা হারানোসহ নানা ক্ষতির কারণে বার্ষিক বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়ে; World Bank-এর হিসাব অনুযায়ী শুধুমাত্র বাংলাদেশের জলবায়ুজনিত ক্ষতি বছরে ২–৩% জিডিপি পর্যন্ত হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, অবকাঠামো মেরামত এবং পুনর্গঠনে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা দেয়, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কূটনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে। তাই, এই তহবিল শুধু অর্থনৈতিক সহায়তার উৎস নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বৈশ্বিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান মাধ্যম।

(ঘ) **আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অরাষ্ট্রীয় কর্মক (Not-State Actors) বলতে কী বোঝায়?**

নমুনা উত্তর : আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অরাষ্ট্রীয় কর্মক (Non-State Actors) বলতে সেই সকল ব্যক্তি বা সংগঠনকে বোঝায় যারা কোনো রাষ্ট্র বা সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে না থেকেও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা বা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এদের নিজস্ব লক্ষ্য, স্বার্থ ও সক্ষমতা থাকে, এবং তারা রাষ্ট্রের মতোই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। অরাষ্ট্রীয় কর্মকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়—

আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন: জাতিসংঘ, WTO)
বহুজাতিক কোম্পানি (যেমন: Apple, Shell)
বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও (যেমন: Amnesty International, Greenpeace)
সন্ত্রাসী বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী (যেমন: আল-কায়েদা, ISIS)
আঞ্চলিক জোট, সামাজিক আন্দোলন ও ট্রান্সন্যাশনাল নেটওয়ার্ক

(ঙ) Soft Power (শক্তি) ও Hard Power (শক্তি) বলতে কী বোঝায়?

নমুনা উত্তর : Hard Power হলো কোনো রাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে অন্য রাষ্ট্রকে প্রভাবিত বা বাধ্য করার ক্ষমতা। এতে সামরিক হুমকি, যুদ্ধক্ষমতা, অস্ত্রব্যবস্থা, নিষেধাজ্ঞা ও অর্থনৈতিক চাপ অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, SIPRI–র ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় ছিল ৮৮৬ বিলিয়ন ডলার, আর চীনের ব্যয় ছিল প্রায় ২৯৬ বিলিয়ন ডলার—যা বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যে হার্ড পাওয়ারের গুরুত্ব স্পষ্ট করে। একইভাবে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা হার্ড পাওয়ারের অর্থনৈতিক রূপ হিসেবে কাজ করে।

অন্যদিকে, Soft Power হলো আকর্ষণ, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, কূটনীতি, শিক্ষা ও নৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। এতে জোর বা চাপ নয়, বরং স্বেচ্ছায় গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়। "Global Soft Power Index ২০২৪" অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপান শীর্ষ তিনটি সফট পাওয়ারধারী দেশ; যুক্তরাষ্ট্রের স্কোর ছিল ৭৪.৮, যা সাংস্কৃতিক প্রভাব, প্রযুক্তি, এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় তার সক্ষমতাকে নির্দেশ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার K-pop, জাপানের এনিমে সংস্কৃতি এবং UNESCO-র মতো সাংস্কৃতিক কূটনীতি সফট পাওয়ার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে হার্ড ও সফট পাওয়ার মিলেই একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক আন্তর্জাতিক প্রভাব—যাকে স্মার্ট পাওয়ারও বলা হয়।

(চ) ব্রিকস (BRICS) জোটের সম্প্রসারণ আন্তর্জাতিক ক্ষমতায় কী পরিবর্তন আনতে পারে?

নমুনা উত্তর : BRICS হলো উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তির একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় জোট, যা প্রথমে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা—এই পাঁচ দেশের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ২০০৯ সালে BRIC হিসেবে এর কার্যক্রম শুরু হলেও ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্ত হওয়ায় এটি BRICS হয়। ২০২৪ সালে জোটটি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়ে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, মিশর, ইথিওপিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশকে সদস্যপদ প্রদান করে। বর্তমানে BRICS দেশগুলো বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৪২%, বিশ্ব অর্থনীতির ৩০%+, এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের ২৫% নিয়ন্ত্রণ করে—যা এটিকে পশ্চিমা শক্তিকেন্দ্রের বাইরে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক ব্লকে রূপ দিয়েছে।

সম্প্রসারণের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে দৃশ্যমান পরিবর্তন আসতে পারে। প্রথমত, নতুন সদস্য যুক্ত হওয়ায় BRICS-এর সমষ্টিক জিডিপি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং তেল–গ্যাস রপ্তানিকারক দেশগুলো যুক্ত হওয়ায় জোটটি জ্বালানি বাজারেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। এটি ডলার-নির্ভরতা হ্রাস করে বিকল্প পেমেন্ট সিস্টেম বা যৌথ মুদ্রা তৈরির প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, চীন–ভারত নেতৃত্বে গঠিত এই জোট বিশ্বব্যাপী বহুমেরুকরণ (multipolarity) ত্বরান্বিত করবে, যেখানে পশ্চিমা জোট (যেমন G7, EU, যুক্তরাষ্ট্র)-এর একক আধিপত্য কমে আসতে পারে। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়বে, যা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসকে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করবে।

(ছ) গ্লোবাল সাউথের উত্থান কীভাবে ঐতিহ্যিক উত্তর-দক্ষিণ বিভাজনকে চ্যালেঞ্জ করছে?

নমুনা উত্তর : গ্লোবাল সাউথ বলতে মূলত এশিয়া (ইসরায়েল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বাদে), আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল এবং ওশেনিয়া (অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বাদে) অঞ্চলের উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশগুলোকে বোঝায়, যেগুলো ঐতিহাসিকভাবে উপনিবেশবাদ, দারিদ্র্য ও বৈশ্বিক বাণিজ্যে অসাম্যজনিত কারণে পিছিয়ে ছিল। ২০২৫ সালের হিসাবে চীন, ভারত, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া ও মেক্সিকোর মতো দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিল্প, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যে উন্নতি দেখানো ডেটা অনুসারে—এই দেশগুলো এখন বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৪৫%, বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৫০% (PPP ভিত্তিক) এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রায় ৪০% দখল করে। এই সংখ্যাগুলো প্রমাণ করে যে গ্লোবাল সাউথ এককভাবে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা নিতে সক্ষম, যা পুরনো উত্তর–দক্ষিণ বৈশ্বিক বিভাজনের চিত্র পরিবর্তনের সূচনা করছে।

গ্লোবাল সাউথের এই উত্থান মূলত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক শক্তি পুনর্বিন্যাস ঘটাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রসারিত BRICS (চীন, ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব, UAE, মিশর, ইথিওপিয়া ও ইরান) বিশ্বের জিডিপির প্রায় ৪০% এবং বৈশ্বিক তেলের প্রায় ৪৩% নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা G20 ও WTO-তে সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করছে, দক্ষিণ–দক্ষিণ বাণিজ্য ও ডলারবহির্ভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাড়াচ্ছে এবং জলবায়ু ন্যায়বিচার ও ঋণ পুনর্গঠনের মতো আন্তর্জাতিক নীতিতে মূল ভূমিকা নিচ্ছে। এর ফলে পুরনো উত্তর-দক্ষিণ বিভাজনের পশ্চিমা আধিপত্য ধীরে ধীরে কমছে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে বহুমেরুকরণ (multipolarity) শক্তিশালী হচ্ছে।

(জ) Debt Trap Diplomacy ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা উত্তর : Debt Trap Diplomacy হলো এমন একটি কূটনৈতিক নীতি যেখানে একটি শক্তিশালী দেশ আর্থিক ঋণের মাধ্যমে অন্য দেশকে নির্ভরশীল করে ফেলে এবং পরে ঋণ দিতে না পারার পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক, কৌশলগত বা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করে। সাধারণত এই নীতি অবলম্বনকারী দেশটি বড় পরিমাণ ঋণ দেয়, বিশেষ করে অবকাঠামো প্রকল্প, বন্দরের উন্নয়ন বা শক্তি খাতে, যাতে ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)-এর আওতায় পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে সহ বিভিন্ন দেশে কোটি কোটি ডলারের ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষভাবে, শ্রীলঙ্কার Hambantota Port-এর ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধে অসুবিধার কারণে ২০১৭ সালে চীন ৯৯ বছরের জন্য বন্দরের লিজ নিয়েছে, যা Debt Trap Diplomacy-এর অন্যতম পরিচিত উদাহরণ।

এই নীতির মাধ্যমে ঋণদাতা দেশ আন্তর্জাতিক কৌশলগত সুবিধা অর্জন করে যেমন সামরিক, নৌপথ বা রাজনৈতিক প্রভাব। ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, BRI-এ চীনের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার, যা ৬০টিরও বেশি দেশকে প্রভাবিত করছে। Debt Trap Diplomacy আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি ভারসাম্যকে পরিবর্তন করতে পারে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বতন্ত্র নীতি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং ঋণগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলোর উপর দূর্নীতি ও কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে।

(ঝ) 'কমপিটিশন স্টেট' (Competition State) বলতে কী বোঝায়?

নমুনা উত্তর : কমপিটিশন স্টেট হলো এমন একটি রাষ্ট্র যা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে তার নীতি, প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামো এবং মানবসম্পদকে কৌশলগতভাবে পরিচালনা করে। এর মূল লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করা এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা। এই ধরনের রাষ্ট্র শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, অবকাঠামো ও রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, সিঙ্গাপুর ২০২৪ সালে বৈশ্বিক রপ্তানিতে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার অবদান রেখেছে এবং প্রতি বছর ৩.৫% GDP বৃদ্ধি করেছে, যা ছোট রাষ্ট্র হলেও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তার নেতৃত্বকে প্রমাণ করে।

কমপিটিশন স্টেট শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি আন্তর্জাতিক প্রভাব বৃদ্ধিতেও সক্রিয়। দক্ষিণ কোরিয়া ICT ও প্রযুক্তি খাতে বছরে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে বৈশ্বিক বাজারে শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করছে। এছাড়া এই রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক নীতি, শক্তি ভারসাম্য এবং বৈশ্বিক কৌশলগত প্রভাবও প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন তাদের উদ্ভাবনী অর্থনীতি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে কমপিটিশন স্টেট ধারণা বোঝায় কিভাবে রাষ্ট্রগুলো কৌশলগতভাবে প্রতিযোগিতা এবং বৈশ্বিক নেতৃত্ব অর্জনের জন্য নিজেদের নীতি ও সংস্থাগুলোকে পুনর্গঠন করে।

(ঞ) খাদ্য নিরাপত্তা কীভাবে কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে?

নমুনা উত্তর : খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায় যে একটি দেশ তার জনগণের জন্য পর্যাপ্ত, পুষ্টিকর এবং নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে। তবে আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এটি শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশগুলো অন্য রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব হিসেবে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে FAO-এর খাদ্য মূল্য সূচক (Food Price Index) ১৩০.১ পয়েন্টে পৌঁছেছে, যা খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্য-অভাব সৃষ্টি করেছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশ এ কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখে পড়েছে, যা শক্তিধর দেশগুলোকে তাদের কূটনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ দিয়েছে।

আজকাল বহু দেশ খাদ্য নিরাপত্তাকে আন্তর্জাতিক প্রভাব ও কৌশলগত সিদ্ধান্তের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়া সাব-সাহারা আফ্রিকায় ২০২৪ সালের জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে ২.৭ মিলিয়ন টন গম রফতানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, চীন ও ভারত আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য রপ্তানি সীমাবদ্ধতা ব্যবহার করে কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা কেবল অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করছে না, বরং বৈশ্বিক কৌশলগত প্রভাব এবং শক্তির ভারসাম্য নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে।

(ট) নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ (Arms Control) এর মধ্যে পার্থক্য কী?

নমুনা উত্তর :

বৈশিষ্ট্য	নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament)	অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ (Arms Control)
সংজ্ঞা	অস্ত্র সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস বা বিলোপ	অস্ত্রের সংখ্যা, উৎপাদন, ব্যবহার বা সম্প্রসারণে সীমা আরোপ
লক্ষ্য	সামরিক ক্ষমতা হ্রাস, শান্তি প্রতিষ্ঠা	সংঘাত রোধ, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
প্রক্রিয়া	অস্ত্র ধ্বংস, নিষিদ্ধকরণ, চুক্তি	সীমা নির্ধারণ, পরিদর্শন, চুক্তি, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ
উদাহরণ	START-I (১৯৯১) – পরমাণু অস্ত্র হ্রাস	SALT-I (১৯৭২) – ক্ষেপণাস্ত্র সংখ্যা সীমিত
প্রভাব	অস্ত্র সরাসরি কমে যায়	অস্ত্র থাকে, কিন্তু সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হয়
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট	যুদ্ধ ঝুঁকি হ্রাস, শান্তি প্রচার	প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ন্ত্রণ, কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখা
কৌশলগত ব্যবহার	দেশগুলোকে অস্ত্রহীন বা কমশক্তিশালী করা	শক্তি ভারসাম্য বজায় রেখে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা রক্ষা

(ঠ) UNFCCC এর মূল লক্ষ্য কী?

নমুনা উত্তর : UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) হলো একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরিওতে Earth Summit-এ গৃহীত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবসৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিরাপদ সীমার মধ্যে রাখা। UNFCCC-এর আওতায় দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য নীতি গ্রহণ, কার্বন নির্গমন কমানো, বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার বাড়ানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়। ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, UNFCCC-এর ১৯৯টি দেশ সদস্য, যারা একত্রে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ২°C-এর মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্য নিয়েছে। UNFCCC-এর অধীনে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত COP (Conference of the Parties) সম্মেলনগুলো আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতি ও সহযোগিতার মূল ফোরাম হিসেবে কাজ করে। এই সম্মেলনে দেশগুলো নিজেদের জাতীয় পরিকল্পনা, কার্বন হ্রাসের অগ্রগতি, প্রযুক্তি ও অর্থায়ন বিষয়ক অগ্রগতি উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি COP21-এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল, যেখানে দেশগুলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক কার্বন নির্গমন প্রায় ৪৫% হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এছাড়া COP সম্মেলন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য Climate Finance এবং প্রযুক্তি সহায়তার সুযোগ নিশ্চিত করে, যা বৈশ্বিক জলবায়ু নীতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২. নিম্নলিখিত যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লিখুন : ১৫×৩ = ৪৫

**** নির্দেশনা :**

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ১০ - ১১ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৫ - ৬, এভারেজ নম্বর ৭ - ৮।
iii. প্রশ্নের উত্তরে মূল বিষয়টি তুলে ধরলে, নির্ভুল তথ্য, সাম্প্রতিক তথ্যের রেফারেন্স এবং মানচিত্র দিলে ভাল নম্বর পাবে।
iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
v. খাতার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন। খাতা মূল্যায়ন শেষে খাতার দ্বিতীয় বা শেষ পৃষ্ঠায় আলাদাভাবে ৪/৫টি মন্তব্য লিখে দিবেন প্লিজ।

(ক) দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক গণআন্দোলন ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এ অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আঞ্চলিক শক্তি ভারসাম্য এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রভাবকে কীভাবে প্রভাবিত করছে তা বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো—বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান—ঐতিহাসিকভাবে উপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘ প্রভাবের অধীনে থেকেছে। ইউরোপীয় শক্তিগুলো এই অঞ্চলকে কাঁচামালের উৎস এবং নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের বাজারে পরিণত করেছিল। ফলে স্থানীয় অর্থনীতি কৃষিনির্ভর ও শিল্পায়নহীন হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অভাব এবং সামাজিক অসমতা জন্মায়। স্বাধীনতার পরেও এ অঞ্চল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকে—যেমন দুর্নীতি, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা।

সাম্প্রতিক গণআন্দোলন: শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপাল

শ্রীলঙ্কা : ২০২২ সালে অর্থনৈতিক সংকট ও রাজাপাক্সা পরিবারের ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের কারণে "Aragalaya" আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন অর্থনৈতিক দুর্বলতা, ঋণ বোঝা, জ্বালানি ও খাদ্য ঘাটতির মতো বাস্তব সমস্যার প্রতিবাদ হিসেবে তৈরি হয়েছিল। আন্দোলনটি শুরুর দিকে শান্তিপূর্ণ হলেও ধীরে ধীরে গণসংগ্রামে পরিণত হয়। অবশেষে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন। শ্রীলঙ্কার এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতাও ভেঙে যেতে পারে।

বাংলাদেশ: ২০২৪ সালের জুলাইতে কোটা সংস্কার ইস্যু কেন্দ্র করে ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। এটি দ্রুত জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়, যেখানে সাধারণ জনগণ সরকার পতনের দাবিতে রাস্তায় নামে। এই আন্দোলনে নারীদের বিশেষ অংশগ্রহণ লক্ষ্যনীয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজরেও এই আন্দোলন আসে। অবশেষে, শেখ হাসিনা সরকার পতিত হয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসে। বাংলাদেশের আন্দোলন শুধু সরকারী নীতি ও দুর্নীতির প্রতিবাদ ছিল না; এটি জাতীয় সার্বভৌমত্ব, সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

নেপাল : ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নেপাল সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্র ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এটি ডিজিটাল আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও দ্রুত গণবিক্ষোভে রূপ নেয়। 'নেপো কিডস' নামক আন্দোলনটি রাজনৈতিক নেতৃত্বহীন, তরুণ নেতৃত্বাধীন, এবং প্রজন্মের ক্ষোভ ও বঞ্চনা প্রকাশ করে। সরকারি ভবন ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের চাপে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে—শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপাল—যে আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছে, তা বিভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও কিছু মিল ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

মিল : প্রথমত, সব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। জনগণ দেখিয়েছে যে রাষ্ট্রীয় অন্যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার বা অনিয়ম সহ্য করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনগুলোর বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থী ও তরুণরা রাস্তায় নেমে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের দাবি তুলেছে।

তৃতীয়ত, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার আন্দোলন সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, সমর্থক সংগ্রহ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ আকৃষ্ট হয়েছে।

চতুর্থত, সরকার বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক পর্যায়ে দমননীতি ও অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করলেও এতে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়েছে।

পার্থক্য : শ্রীলঙ্কার আন্দোলন অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সংঘটিত হয় (জ্বালানি, খাদ্য ও ঋণের ঘাটতি)। বাংলাদেশে আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক অবাধ্যতা ও কোটা সংস্কারের প্রতিবাদ। নেপালে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল স্বাধীনতার দাবিতে সোশ্যাল মিডিয়া সেন্সরশিপের প্রতিবাদ।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রভাব : এই আন্দোলনগুলো দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে। সাধারণ জনগণ প্রমাণ করেছে যে তারা শুধু দর্শক নয়; তারা রাষ্ট্রীয় অন্যায় সহ্য করবে না। দেশগুলোতে তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণের অংশগ্রহণ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক প্রভাব হিসেবে ভারত, পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশগুলো তাদের ভূ-রাজনৈতিক কৌশল পুনর্মূল্যায়ন করছে। নেপালের উদাহরণ প্রমাণ করে যে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে তরুণরা দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যা ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ সুগম করবে।

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও করণীয়:

১. **গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ:** নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করতে হবে।

২. **রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ:** নাগরিকদের ভোটাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।

৩. **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দমন:** কার্যকর আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ করা।

৪. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন:** দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা প্রসার এবং বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণ। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীলঙ্কায় খাদ্য ও জ্বালানি সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৫. **আঞ্চলিক সহযোগিতা:** সার্কের কার্যকরীকরণ এবং বহিরাগত প্রভাব কমানো।

৬. **নারী ও তরুণ ক্ষমতায়ন:** রাজনীতিতে সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা।

দক্ষিণ এশিয়ার আন্দোলনগুলো দেখিয়েছে যে জনগণ স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। এগুলো শুধু দেশীয় রাজনীতিতেই নয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কৌশলেও প্রভাব ফেলছে। আগামী প্রজন্মের জন্য এগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

(খ) "ট্রাম্পের সাম্প্রতিক এশিয়া সফরকে যুক্তরাষ্ট্রের চীনকেন্দ্রিক নতুন ভূরাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিশ্লেষণ করুন। এ সফর কীভাবে বিশ্ব রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে?

নমুনা উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফর (অক্টোবর ২০২৫) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পাঁচদিনের এই সফরে ট্রাম্প মালয়েশিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং এশিয়ার বাণিজ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা নীতি প্রভাবিত করার জন্য এক সুপরিকল্পিত কৌশল অনুসরণ করেন।

সফরের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট

ট্রাম্পের এশিয়া সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল-

চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলা : চীনের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রাধান্যে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। ট্রাম্প এই অঞ্চলে মার্কিন প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও চীনের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থিতিশীলতা ও শান্তি : থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত বিরোধ, দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তা, জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য চুক্তি—এই সমস্ত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি বাস্তবায়ন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে কৃষি, প্রযুক্তি, জ্বালানি ও সেমিকন্ডাক্টর খাতে চুক্তি স্বাক্ষর করা।

সফরের প্রধান ঘটনা ও ফলাফল

১. মালয়েশিয়া ও আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন : মালয়েশিয়ায় ট্রাম্প আসিয়ান সম্মেলনে অংশ নেন। থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ সমাধানে মধ্যস্থতা করেন এবং 'কুয়ালালামপুর শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি প্রায় ৫,০০,০০০ মানুষকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করেছে এবং অঞ্চলটির স্থিতিশীলতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

২. জাপান সফর : জাপানে ট্রাম্প নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। জাপান তার শান্তি উদ্যোগ এবং কূটনৈতিক দক্ষতার জন্য ট্রাম্পকে প্রশংসা করে এবং নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার ঘোষণা দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় তিনি রাষ্ট্রপতি লি জে মিয়ংয়ের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেন এবং দেশটির সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'গ্র্যান্ড অর্ডার অব মুগুংহওয়া' পান। এছাড়া, বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৩. দক্ষিণ কোরিয়া সফর : দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি লি জে মিয়ং ট্রাম্পকে 'গ্র্যান্ড অর্ডার অব মুগুংহওয়া' প্রদান করেন। এছাড়াও মার্কিন-বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

৪. ট্রাম্প-শি বৈঠক (চীন) : বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ট্রাম্প-শি বৈঠক, যা বুসানে অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের উত্তেজনা হ্রাস এবং সমঝোতার লক্ষ্যে এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। চীন মার্কিন বাজারে বিরল খনিজ রপ্তানি সহজতর করতে সম্মত হয়, সয়াবিন আমদানি বাড়ায় এবং ফ্যান্টানিল উৎপাদন বন্ধের বিষয়ে সম্মতি দেয়। অপরদিকে, মার্কিন শুল্ক ১০ শতাংশ কমানো হয়। প্রযুক্তি ও সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে সীমিত সমঝোতাও হয়। এই সমঝোতা মূলত চীনকে আস্থায় নিয়ে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে চীনের সম্পর্কের দূরত্ব বৃদ্ধি করার যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলের অংশ।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব-

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণ : ট্রাম্পের সফরে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়ায় ১৯% শুল্কে আমেরিকার পণ্য আমদানি করা সম্ভব হয়েছে।

চীনের সঙ্গে ভারসাম্য : বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র চীনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। এ ধরনের সমঝোতার মাধ্যমে মার্কিন বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করা হয়েছে।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা : ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার প্রয়াস।

কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব : আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা: থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়ার অস্ত্রবিরতি, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার চুক্তি এবং মালয়েশিয়ার মাধ্যমে আসিয়ানের সংহতি—এসব আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছে।

চীনকেন্দ্রিক কৌশল : ট্রাম্পের কৌশল চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখে অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে চীনের দূরত্ব সৃষ্টি করা। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যকার কূটনৈতিক ভারসাম্য এবং মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক।

প্রশংসা ও কূটনৈতিক দক্ষতা: এশিয়ার দেশগুলোর নেতারা ট্রাম্পকে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা ও প্রশংসার মাধ্যমে মার্কিন প্রভাব নিশ্চিত করেছেন।

বিশ্ব রাজনীতিতে সম্ভাব্য প্রভাব-

যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের নতুন দিক : দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও সমঝোতার মাধ্যমে বাণিজ্য যুদ্ধের উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর স্বাধীনতা : দেশগুলো এখন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে কূটনীতি চালাতে পারবে।

আঞ্চলিক অর্থনীতি ও মানবসম্পদ : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৬০% অধ্যুষিত হওয়ায়, এই অঞ্চল এখন আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের এশিয়া সফর একটি বহুমাত্রিক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে চীনকেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভ,রাজনৈতিক নীতি, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কূটনৈতিক প্রশংসা ও অর্থনৈতিক প্রভাবের মিশ্রণ স্পষ্ট দেখা গেছে। এটি শুধু আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক রাজনীতি এবং অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী বছরের ট্রাম্প-শি বৈঠক এবং বাণিজ্য নীতির ফলাফল বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(গ) "বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সমন্বয় কীভাবে দেশের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ওপর প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণ করুন।"

নমুনা উত্তর : বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি : সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানসিক দূরত্ব ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি করেছে।

শেখ হাসিনা ইস্যু : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে জটিল কূটনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা তাকে প্রত্যর্পণের দাবি জানালেও, দিল্লি নিরাপত্তা ও মানবিক কারণ দেখিয়ে আপাতত তাতে রাজি নয়, যা দুই দেশের সরকারের মধ্যে সম্পর্ককে তলানিতে নিয়ে এসেছে।

সীমান্ত এবং বাণিজ্য : ভারতের পক্ষ থেকে পর্যটন ভিসা সীমিত করা, সীমান্ত অপরাধ ও হত্যার মতো পুরোনো সমস্যাগুলো এখনও অমীমাংসিত রয়েছে। যদিও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেন এখনও সক্রিয় আছে (বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার), তবে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে এই সম্পর্কের কৌশলগত সুবিধা ভারত হারাতে পারে বলে উদ্বেগ রয়েছে।

নীতি পরিবর্তন : অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর 'ভারতকেন্দ্রিক নীতি' বর্জনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা কূটনৈতিক উদ্যোগগুলোতে ভারতের প্রভাব সীমিত করার ইঙ্গিত বহন করে।

চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সমন্বয় : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের এই পটভূমিতেই, বাংলাদেশ চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করছে। এটি দেশের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক : চীন বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং অন্যতম প্রধান বিনিয়োগকারী ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা : চীন বাংলাদেশের অবকাঠামো, জ্বালানি ও প্রযুক্তি খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশ চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে (BRI) যোগ দিয়েছে এবং শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখার বিষয়েও ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে।

সামরিক সম্পর্ক : চীন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকীকরণে সহায়তা করে আসছে এবং সামরিক হার্ডওয়্যারের জন্য বৃহত্তম উৎস হিসেবে কাজ করে।

পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক : দীর্ঘদিন বিরতির পর পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ চোখে পড়ছে। কার্গো শিপিং রুট চালু, অর্থনৈতিক যৌথ পরিষদ গঠন এবং উচ্চ-পর্যায়ের কূটনৈতিক সফর এই উষ্ণায়নের সূচক।

ত্রিপক্ষীয় জোট : চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার ঘোষণা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যা ভারতের প্রভাব সীমিত করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ওপর প্রভাব : এই কূটনৈতিক সমন্বয় বাংলাদেশের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনকে একটি দ্বিমুখী প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত করছে।

ইতিবাচক প্রভাব : ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য (Strategic Balancing)

নির্ভরতা হ্রাস: চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের ওপর একক নির্ভরতা কমাতে চাইছে। এটি ভারতকে তাদের কূটনৈতিক অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে এবং ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে উৎসাহিত করতে পারে।

আলোচনার সক্ষমতা বৃদ্ধি : একাধিক প্রধান শক্তির (ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখলে বাংলাদেশ আলোচনা টেবিলে তার সক্ষমতা বাড়াতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও সহায়তার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম শর্তাবলী আদায় করতে পারে।

বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতি: এটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'-এর বাস্তব প্রতিফলন, যা দেশকে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে সহায়তা করে।

নেতিবাচক প্রভাব: ঝুঁকির সম্ভাবনা

ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের ঝুঁকি: চীন-পাকিস্তান বলয়ের দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়লে তা ভারতের সঙ্গে সংঘাতকে তীব্রতর করতে পারে, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

ঋণ ও সামরিক সরঞ্জাম নির্ভরতা: চীনের ব্যাপক বিনিয়োগ এবং সামরিক সরঞ্জামের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভবিষ্যতে ঋণের ফাঁদ (Debt Trap) বা চীনের সামরিক-কৌশলগত স্বার্থের কাছে কম্প্রোমাইজ করার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

স্বায়ত্তশাসনের সীমাবদ্ধতা: কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতা বাংলাদেশের সীমিত হওয়ায়, তার পররাষ্ট্রনীতি এখনও আঞ্চলিক ও বৃহৎ শক্তিগুলোর দ্বারা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত।

বাংলাদেশ তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন রক্ষায় ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েও চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সমন্বয় করছে। এটি মূলত ভারতের একক প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে আঞ্চলিক রাজনীতিতে ভারসাম্যপূর্ণ এবং শক্তিশালী অবস্থান তৈরির একটি উদ্যোগ।

(ঘ) "সুদানে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করুন। বাস্তব প্রেক্ষাপটে সুদানে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে?

নমুনা উত্তর : সুদানে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ ও অস্থিতিশীলতার মূল কারণগুলো বহুস্তরীয় এবং গভীরভাবে ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রোথিত। এই জটিলতাকে বিশ্লেষণ করে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হলো:

সুদানে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মূল কারণসমূহ : সুদানে চলমান সংঘাতের মূল কারণকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. সামরিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব

ক্ষমতার ভাগাভাগির ব্যর্থতা (RSF বনাম SAF) : বর্তমান গৃহযুদ্ধের প্রধান কারণ হলো সুদানের দুটি প্রধান সামরিক সংস্থা—আর্মি (সুদান সশস্ত্র বাহিনী বা SAF) এবং আধাসামরিক বাহিনী (র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা RSF)-এর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব।

সামরিক শাসন: উভয় বাহিনীই দেশের সামরিক সরকারের অংশ ছিল এবং বেসামরিক শাসনে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো ঐকমত্য হয়নি। প্রতিটি পক্ষই ক্ষমতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদের একচেটিয়া দখল চেয়েছিল।

আরএসএফ-এর অন্তর্ভুক্তি : সাবেক শাসক ওমর আল-বশিরের দ্বারা সৃষ্ট এবং সমর্থিত আরএসএফ-কে জাতীয় আর্মিতে একীভূত করার প্রক্রিয়াটি ছিল সংঘাতের একটি মূল ট্রিগার, কারণ এর ফলে আরএসএফ তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন হারানোর ভয় পেয়েছিল।

গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি : সুদানে কখনোই কার্যকর ও টেকসই গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। সামরিক অভ্যুত্থান এবং কর্তৃত্ববাদী শাসন বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করেছে, যা বারবার সংঘাতের পথ খুলে দিয়েছে।

২. জাতিগত ও আঞ্চলিক বিভাজন (ঐতিহাসিক)

জাতিগত বিভাজন : ঐতিহাসিক এবং ঔপনিবেশিক প্রভাবের কারণে সৃষ্ট জাতিগত ও আঞ্চলিক বিভাজন সংঘাতকে আরও গভীর করেছে। দারফুর এবং অন্যান্য প্রান্তিক অঞ্চলে জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জমি, জল ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতা রয়েছে।

কেন্দ্র-প্রান্ত বৈষম্য : খার্তুমকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো দেশের প্রান্তিক ও প্রত্যন্ত অঞ্চল, বিশেষ করে দারফুর, ব্লু নাইল ও কর্দোফানের জনগণ থেকে সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। এই বঞ্চনার অনুভূতি সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক কারণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ

তেল ও খনিজ সম্পদ : তেল, সোনা এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ সংঘাতের অন্যতম চালিকাশক্তি। সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো (বিশেষ করে RSF) অবৈধ সোনার খনি থেকে বিপুল অর্থ উপার্জন করে, যা তাদের সামরিক কার্যক্রমকে সচল রাখে।

দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা: দীর্ঘদিনের সংঘাত এবং দুর্বল শাসনব্যবস্থা দেশটিতে চরম দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক হতাশা অনেক যুবককে সশস্ত্র দলে যোগ দিতে বাধ্য করে।

৪. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ

বাহ্যিক প্রভাব: মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, এবং রাশিয়া/ওয়াগনারের মতো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো তাদের নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থ হাসিলের জন্য সুদানের সামরিক গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন ও অস্ত্র সরবরাহ করে সংঘাতকে আরও জটিল করেছে।

দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা

সুদানে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই একটি সমন্বিত, বহু-আঙ্গিক এবং সংঘাতের মূল কারণগুলো সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখে কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

১. অবিলম্বে সংঘাত বন্ধে কূটনৈতিক চাপ

ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা: জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU), ইন্টারগভর্নমেন্টাল অথরিটি অন ডেভেলপমেন্ট (IGAD), এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোকে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে এসে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

নিষেধাজ্ঞা: যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনকারী সামরিক নেতা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যযুক্ত আর্থিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে, যাতে তাদের অর্থের উৎস শুকিয়ে যায়।

আলোচনার প্ল্যাটফর্ম: একটি আফ্রিকান নেতৃত্বাধীন, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত নিরপেক্ষ আলোচনার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে, যেখানে সামরিক পক্ষগুলোর পাশাপাশি সুদানের সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক দলগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. নিরাপত্তা এবং সামরিক কাঠামো সংস্কার (SSR)

সামরিক সংহতি: যুদ্ধবিরতির পর SAF ও RSF-কে একীভূত করে একটি একক, পেশাদার, এবং বেসামরিক নেতৃত্বের অধীনে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ এবং সময়সীমা নির্দিষ্ট।

অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ (DDR): আধাসামরিক বাহিনী এবং বিভিন্ন মিলিশিয়াদের নিরস্ত্রীকরণ, বিমোচন এবং সমাজে পুনর্বাসনের (DDR) জন্য পর্যাপ্ত তহবিল ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

৩. মানবিক সহায়তা ও যুদ্ধাপরাধের বিচার

মানবিক করিডোর: মানবিক সহায়তা বিতরণের জন্য নিরাপদ করিডোর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা এবং বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ মানুষের জন্য জরুরি খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

জবাবদিহিতা: আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এটি ভবিষ্যতে একই ধরনের সংঘাত প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

৪. অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন:

কেন্দ্র-প্রান্ত বৈষম্য নিরসন : আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (IMF, বিশ্বব্যাংক) এবং দাতাদের উচিত শুধুমাত্র খার্তুমকে নয়, বরং দেশের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতেও সরাসরি বিনিয়োগ ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে সহায়তা প্রদান করা।

সোনার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ : অবৈধভাবে সোনা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ পাচার বন্ধে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া, যা সংঘাতকে অর্থায়ন করে।

৫. বেসামরিক ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা :

অবকাঠামো নির্মাণ : একটি নতুন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুদানের সুশীল সমাজ, নারী নেতৃত্ব এবং তরুণদের অংশগ্রহণের জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

নির্বাচনে সহায়তা : একটি বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ নির্বাচন আয়োজনে জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের মাধ্যমে নিরীক্ষণ ও নিরাপত্তা সহায়তা নিশ্চিত করা।

শান্তি প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হবে যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কেবল সামরিক পক্ষগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করবে না, বরং সুদানের জনগণের জন্য একটি স্থিতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের পথ খুলে দেবে।

৩. Problem Solving Question

কল্পনা করুন, আপনার শহরটি এমন এক অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। বর্ষার সময়ে নদী ও খালের পানি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, শহরের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। গরমের ঢেউ তীব্র হচ্ছে এবং খরার সময় কৃষি, পানি সরবরাহ এবং নাগরিক জীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। সুপরিকল্পিত জলবায়ু নীতি না থাকায় নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষ জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে জলবায়ু-নির্ভর প্রযুক্তি, ডিজিটাল সতর্কতা ব্যবস্থা এবং তথ্যভিত্তিক সমাধান ব্যবহার করছে, যা অল্প কিছুটা হলেও জীবন সহজ করেছে। তবুও নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমেই ক্ষয় হচ্ছে–নদীর জলস্তর হ্রাস পাচ্ছে, সবুজ অঞ্চল ও পার্ক কমছে, বাতাস ও পানির দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের অবকাঠামো, জনস্বাস্থ্য এবং মানুষের জীবনযাত্রা এ প্রভাবের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে উত্তর দিন :

**** নির্দেশনা :**

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে প্রতিটিতে সর্বোচ্চ ৩ - ৩.৫ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ২ - ২.৫, এভারেজ নম্বর ৩।
iii. প্রশ্নের উত্তরে মূল বিষয়টি তুলে ধরলে, নির্ভুল তথ্য, সাম্প্রতিক তথ্যের রেফারেন্স এবং মানচিত্র দিলে ভাল নম্বর পাবে।
iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
v. খাতার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন। খাতা মূল্যায়ন শেষে খাতার দ্বিতীয় বা শেষ পৃষ্ঠায় আলাদাভাবে ৪/৫টি মন্তব্য লিখে দিবেন প্লিজ।

(ক) এই ধরনের শহরে জীবনযাত্রার সুবিধা এবং ঝুঁকি কীভাবে ভারসাম্য করা যায়?

নমুনা উত্তর :

জীবনযাত্রার সুবিধা এবং ঝুঁকির ভারসাম্য : এই ধরনের জলবায়ু-বিপর্যস্ত শহরে জীবনযাত্রার সুবিধা (Adaptation) এবং ঝুঁকি (Vulnerabilities)-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে কেবল সমস্যা মোকাবিলা নয়, বরং স্থিতিস্থাপক উন্নয়ন (Resilient Development)-এর দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

সুবিধাকে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতায় রূপান্তর : বর্তমানে ডিজিটাল সতর্কতা ব্যবস্থা (বন্যা বা হিট ওয়েভ অ্যালার্ট) ব্যবহার করে যে তাৎক্ষণিক সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, তাকে অবশ্যই সবুজ অবকাঠামো (Green Infrastructure) নির্মাণে বিনিয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকির মূল কারণ মোকাবিলায় ব্যবহার করতে হবে। যেমন—নদী বা খালের পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবলমাত্র বালির বস্তা না ফেলে, বরং বড় আকারের নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প এবং জলাভূমি সংরক্ষণ করতে হবে, যা বন্যার প্রভাব কমাবে এবং গ্রীষ্মে পানির উৎস হিসেবে কাজ করবে।

ঝুঁকি-ভিত্তিক বিনিয়োগ: দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জলবায়ু-অসহিষ্ণু আবাসন এবং ভঙ্গুর পরিবহন ব্যবস্থার মতো উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অর্থনৈতিক সুযোগকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তা পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস করে। উদাহরণস্বরূপ, সবুজ ও জলবায়ু-প্রমাণ অবকাঠামো নির্মাণে জড়িত 'সবুজ কাজের সুযোগ' সৃষ্টি করা।

অর্থনৈতিক ক্ষতি হ্রাস: চরম আবহাওয়ার কারণে কৃষি ও শিল্প খাতে যে ক্ষতি হচ্ছে, তা কমাতে জলবায়ু ঝুঁকি বীমা (Climate Risk Insurance) চালু করতে হবে। পাশাপাশি, ডেটা-ভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতি হ্রাস করতে হবে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে।

(খ) নাগরিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে কোন ধরনের প্রযুক্তি ও সামাজিক উদ্যোগ প্রয়োজন হতে পারে?

নমুনা উত্তর : নাগরিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান এবং সামাজিক উদ্যোগের সমন্বয় অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

প্রযুক্তিগত উদ্যোগ-

স্মার্ট সতর্কীকরণ এবং তথ্য ব্যবস্থা:

Flood Early Warning System (FEWS) : নদী ও খালের জলস্তর পরিমাপের জন্য ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) সেন্সর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে বন্যার সঠিক পূর্বাভাস দিতে হবে।

তাপমাত্রা ও বায়ু পর্যবেক্ষণ : তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার ডেটা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন এলাকার জন্য 'হিট স্ট্রেস লেভেল' সতর্কতা জারি করা এবং বায়ু ও পানির দূষণের রিয়েল-টাইম ডেটা একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সহজলভ্য করা।

জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা : দুর্যোগের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন এড়াতে স্যাটেলাইট-ভিত্তিক যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং স্ব-চালিত ড্রোন ব্যবহার করে জরুরি চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা।

সামাজিক উদ্যোগ-

সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা কেন্দ্র: প্রতিটি পাড়া বা এলাকায় দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র এবং শীতলীকরণ কক্ষ (Cooling Centers) তৈরি করতে হবে, যা হিট ওয়েভের সময় আশ্রয় ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেবে।

জলবায়ু-বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা: শহরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে জলবায়ু-সংবেদনশীল রোগ (যেমন—ডেঙ্গু, কলেরা, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ) মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং দূষিত পানির কারণে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত জনস্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা।

নাগরিক অংশগ্রহণ : স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে নারী ও বয়স্কদের নিয়ে 'জলবায়ু ভলান্টিয়ার গ্রুপ' গঠন করা, যারা দুর্যোগের সময় দুর্বল গোষ্ঠীকে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে অংশ নেবে।

(গ) নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষয় প্রতিরোধে কী ধরনের পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করা উচিত?

নমুনা উত্তর : নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয় রোধ করতে হলে প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান (Nature-Based Solutions) এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য।

নদী ও জলাভূমি পুনরুদ্ধার নীতি : নদীর দখল ও দূষণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে আইন প্রয়োগ করতে হবে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে নিয়মিত খনন (Dredging) এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন করতে হবে। জলাভূমি ও প্রাকৃতিক খালগুলো সংরক্ষণ করে সেগুলোকে 'নীল অবকাঠামো (Blue Infrastructure)' হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

সবুজ অঞ্চল সংরক্ষণ : শহরের মোট এলাকার একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন, ২০%) বাধ্যতামূলকভাবে সবুজ অঞ্চল হিসেবে সংরক্ষণের নীতি তৈরি করা। ভবনের ছাদে ও দেয়ালে সবুজ ছাদ (Green Roof) এবং উল্লম্ব উদ্যান (Vertical Gardens) নির্মাণকে উৎসাহিত করার জন্য ট্যাক্স ছাড় দেওয়া।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ : শিল্প-কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা। প্রতিটি শিল্প ইউনিটের জন্য ইটিপি (Effluent Treatment Plant) স্থাপন বাধ্যতামূলক করে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। পুরনো জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভর যানবাহন পর্যায়ক্রমে বাতিল করে ইলেকট্রিক যানবাহন (EV) ব্যবহারে ভর্তুকি এবং উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করা।

(ঘ) দীর্ঘমেয়াদে শহরটিকে টেকসই ও বাসযোগ্য রাখার জন্য কোন কৌশল বা সমন্বয়মূলক উদ্যোগ কার্যকর হতে পারে?

নমুনা উত্তর : দীর্ঘমেয়াদে শহরটিকে টেকসই ও বাসযোগ্য রাখতে স্থিতিস্থাপকতা (Resilience) এবং অন্তর্ভুক্তি (Inclusivity)-এর উপর জোর দিয়ে একটি সমন্বিত নগর ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

স্পঞ্জ সিটি মডেল (Sponge City Model) : শহরটিকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে তা বৃষ্টির পানি শোষণ ও ধরে রাখতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে: ভেদযোগ্য ফুটপাথ (Pervious Pavements) ব্যবহার, বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড জলাধার তৈরি এবং পার্কগুলোকে অস্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকা হিসেবে ব্যবহার করা। এই পদ্ধতি বন্যার ঝুঁকি কমিয়ে খরার সময় পানির স্তর বাড়াতে সাহায্য করবে।

সমন্বয়মূলক ও অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন : নগর উন্নয়ন সংস্থা, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি স্থায়ী জলবায়ু সমন্বয় টাস্কফোর্স গঠন করা। নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের মতামত এবং বিশেষজ্ঞ জ্ঞানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

অর্থনৈতিক রূপান্তর ও নবায়নযোগ্য শক্তি : স্থানীয় অর্থনীতিকে জলবায়ু-প্রমাণ করতে নবায়নযোগ্য শক্তি (সৌর ও বায়ু শক্তি) উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। জলবায়ু-বান্ধব প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নের জন্য সবুজ বন্ড (Green Bonds) বা বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা করা।

এই সমন্বিত এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক কৌশলগুলো আপনার শহরকে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলা করে একুশ শতকের জন্য একটি স্থিতিশীল ও বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করতে পারে।